আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বৎকৃষ্ট উপায়

সাইফুল্লাহ খালিদ

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহঃ সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র কোনটি? # ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল্লাহ খালিদ # দারুল আরকাম অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক প্রকাশিত # গ্রন্থ স্বত্ত্বঃ লেখক # প্রিন্টিং: শাহাবুদ্দীন, এওজেড প্রিন্টিং। ডিজাইনঃ কাফি আব্দুল্লাহ, ব্রান্ড কম # সার্বিক সহযোগীতায়ঃ কেয়ার বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া।

Infaq fi sabilillah: shorbotkrishto khetro konti? By Eng Syfullah Khalid# Published by Darul Arkam, Australia # All rights reserved by Author # Printing: Sahabuddin, AOZ Printing # Design: Kafi Abdullah, Brand com # Helped by Care Bangladesh, Australia.

Price:
Australia / New Zealand : $ 5.00
USA/ Canada : $ 5.00
Europe: EUR 3.00
United Kingdom : GBP 2.50

আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বৎকৃষ্ট উপায়

সাইফুল্লাহ খালিদ

দারুল আরকাম অষ্ট্রেলিয়া কর্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গ

প্রবাস জীবনে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে যাকে, সে আমার মমতাময়ী মা। যার কাছে "ইসলামের পথে" চলার জন্য সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছি, সেই স্নেহময়ী মা। যার কাছে লেখালেখি আর অধ্যয়নের হাতেখড়ি, সে আমার মা। সেই মা' কে আমার এই প্রথম লেখা বইটি উৎসর্গ করতে চাই।

অতঃপর আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বাবা'কে। যার সততা বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসনের বড় বড় কর্মকর্তাদের কাছে ছিল বিষ্ময়। যার সৎ উপার্জন আমাদের গোটা পরিবারকে সৎ পথে চলার অনুপ্রেরণা যোগায়। সর্বশেষে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যাদের রক্তে সিক্ত হয়েছে বাংলার জমিন, সেই সকল বীর শহীদদের প্রতি ও তাদের পিতা,মাতার প্রতি।

সেন্টমেরীজ মসজিদের ইমামের মতামত

আমার বন্ধুবর সাইফুল্লাহ খালিদ কর্তৃক লিখিত "ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহঃ সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র কোনটি?" বইটি যুগোপযোগী একটি গবেষণা এবং চমৎকার একটি উপস্থাপনা। লেখককে আমার একজন দ্বীনি গবেষক (মুজতাহিদ) বলে মনে হয়েছে এবং বস্তুতঃ তিনি তার একটি গবেষণা (ইজতিহাদ) অত্র বইতে উপস্থাপন করেছেন।

ইসলামী শরিয়াতে ইজতিহাদের (গবেষণার) গণ্ডি তিন প্রকার হতে পারেঃ
১। ইজতিহাদ মুতলাক (সাধারন গবেষণা) যেখানে সাধারনত কোন গবেষক (মুজতাহিদ) দ্বীনের সকল বিষয়ে ইজতিহাদ করে একটা কংক্রিট সমাধান প্রদান করেন এবং সবাই তা অনুসরণ করেন। যেমন ইমাম আযম আবু হানিফা (র) সহ চার ইমামের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তারা সকলেই দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে তাদের মতামত (ফতোয়া) প্রদান করেছেন।

২। ইজতিহাদ ফিল মাজহাব (মাজহাব ভিত্তিক গবেষণা) এ পর্যায়ের মুজতাহিদগন প্রথম পর্যায় থেকে কিছুটা সীমিত পরিসরে ইজতিহাদ করেন এবং একটা বিশেষ নিয়ম নীতির মধ্যে গবেষণা কাজ পরিচালনা করেন। যেমনঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম জুফার (র) – তারা প্রত্যেকেই ইমাম আবু হানিফা (র) এর প্রদর্শিত নীতি (উসুল) অনুসরণ করে ইজতিহাদ করেছেন ও মতামত পেশ করেছেন। সুতরাং তাদের কোন মতামতই ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতামত এর বাইরে নয়। আর এ জন্যই বলা হয় "হানাফী" মাজহাব যেখানে আবু হানিফা (র) এর নীতি অনুসরণ করে অন্যান্য মুজতাহিদগণ মতামত প্রদান করেছেন।

৩। ইজতিহাদ ফিল মাসাআলা (বিষয় ভিত্তিক গবেষণা) যেখানে স্বাধীনচেতা মুজতাহিদগন দীনের বিভিন্ন বিষয় গবেষণা করেন ও তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। এই শ্রেণীর মুজতাহিদগণ সারা জীবনে খুব অল্প বিষয়েই ইজতিহাদ করার সুযোগ পান ও মতামত দিতে পারেন। বর্তমান বিশ্বের ক্লাসিক্যাল মুজতাহিদগণ অর্থনৈতিক, ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স, বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কার (ইনভেন্সন) এর ব্যাপারে তাদের ইজতিহাদ কার্য পরিচালনা করেন ও মতামত প্রদান করেন। বর্তমানে এই মুজতাহিদগণের নেতৃত্বে আছেন ডঃ ইউসুফ আল কারদাভি (মিসর)। এই

মুজতাহিদগণ ওআইসির ফিকহ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ফিকহ কনফারেন্সে তাদের ইজতিহাদ কর্ম উপস্থাপন করেন ও প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে এটাকে কডিফাই করে ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত করেন।

অত্র বইএর লেখককে আমার এই সর্বশেষ শ্রেণীর একজন মুজতাহিদ বলে মনে হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে দুয়া করি আল্লাহ যেন তার এই ইজতিহাদ কর্ম কবুল করেন ও দেশ জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন।

ইসলামী শরিয়াতের সর্বাধুনিক একটি ইজতিহাদ হল ফিকহুল আওলাইয়াত বা তুলনামূলক উত্তম পন্থা নির্বাচন। ইংরেজিতে বিষয়টাকে বলা হয়ঃ jurisprudence of priority অর্থাৎ সমান সমান কয়েকটা ইস্যুর মধ্যেও এই মর্মে ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা যে উভয় ফরযের মধ্যে কোনটি আগে হবে আর কোনটি পরে হবে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই অনেকে কলম ধরেছেন ও বিভিন্ন মাসআলার মধ্যে প্রিফারেন্স প্রদান করেছেন। এই বিষয়ের দলিল আমরা সরাসরি কুরআন থেকেই পাই। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে এমন ব্যক্তিদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং সংগ্রাম -সাধনা করেছে আল্লাহর পথে ? এ উভয় দল আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না। আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ,যারা ঈমান এনেছে এবং তার পথে ঘর-বাড়ি ছেড়েছে ও ধন-প্রাণ সমর্পন করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম।” **(সুরা আত তাওবাঃ ১৯ -২০)**

কোরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য আমরা এখানে একটি হাদিস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি । আমর ইবনে আবাসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একজন সাহাবী মহানবী (সঃ) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ইসলাম কি? তিনি বললেন,তোমার অন্তরকে আল্লাহর জন্য সমর্পন করা এবং তোমার হাত ও জিহ্বা থেকে অপর মুসলমানকে নিরাপদ রাখা” সে জিজ্ঞাস করলঃ কোন ইসলাম উত্তম? রসূল (সঃ) জবাব দিলেনঃ ঈমান, সে আবার জিজ্ঞাস করলঃ হিজরত কি? রসূল (সঃ) জবাব দিলেনঃ অনিষ্ট ছেড়ে দেয়া।সে আবার জিজ্ঞাস করলঃ কোন হিজরত উত্তম? রসূল (সঃ) জবাব দিলেনঃ “জিহাদের জন্য হিজরত। এভাবে কেউ যদি কুরআন এবং হাদীস ভালোভাবে স্টাডি করেন তাহলে লক্ষ্য করবেন যে অনেক সুন্দর ও চমৎকার বর্ণনা রয়েছে যে, কোন কাজটি তুলনামূলক ভাবে ভাল ও উত্তম এবং কোন কাজটি আগে করতে হবে। যেমন কয়েকটি হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেনঃ এক বক্তির নামাজ পড়া থেকে জামাতে নামাজ পড়া সাতাশ গুন সওয়াব বেশী, একদিন আল্লাহর দ্বীনের জন্য পাহারা দেয়া একমাস রোজা রাখা ও নামাজ পড়া থেকে অনেক উত্তম” খারাপ কাজের মধ্যেও ঠিক কোন খারাপ কাজটা বেশী খারাপ ও কোনটা থেকে বেশি দূরে থাকতে হবে তাও রাসুল (সঃ) বলে দিয়ছেন।

তিনি বলেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মানুষ হল যে চরিত্রে উত্তম আর সবচেয়ে বড় চোর হল যে নামাজে চুরি করে,সবচেয়ে বখিল (কৃপণ) হল যে সালাম দিতে কৃপণতা করে।

আসলে মানুষ যদি এই ফিক হুল আউলায়িয়াত বা Jurisprudence of preference বুঝত তাহলে মুসলমানদের অনেক সমস্যাই দ্রুত সমাধান হত। এই কম্পারেটিভ ফিকাহ না বুঝার কারণেই মানুষ দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার হজ্জে যাওয়া অনেক সাওয়াবের কাজ মনে করেন এবং অনেকে আনন্দের সাথে বলেন যে ‘আমার কোন বছর ই হজ্জ বাদ যায় নাই। অথচ তার ঐ টাকাগুলো সমস্যা পীড়িত মুসলিম সমাজের কতো উপকারে লাগতো! সেটা হয়তো তিনি ভেবেই দেখেননি। আল্লাহ আমাদের এই বিষয়টা বুঝার ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

হাফেজ মোহাম্মদ আবু হুরায়রা
(গ্রাজুয়েট, আল আজহার ইউনিভার্সিটি,মিশর)
ইমাম, সেন্টমেরীজ মসজিদ
নিউ সাউথ ওয়েলস, অষ্ট্রেলিয়া।

লেখকের কথা

২০১০ - ২০১৩ মুসলমানদের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। এর মধ্যে আরব বসন্তের মতো একটি উজ্জ্বল ঘটনা থাকলেও চারিদিকে যেন মুসলমানদের লাশের গন্ধ। বার্মার রোহিঙ্গা থেকে শুরু করে সিরিয়া, মধ্য আফ্রিকা কোথায় ঝরছেনা মুসলমানদের রক্ত! মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব কয়টি ধাপ পেরিয়ে গেলেও, মুসলমানদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও,কিছুই আসে যায়নি পাশ্চাত্যের মানবতাবাদীদের।

সবচেয়ে বেশী অন্যায় আর নির্যাতন হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর। ইসলামী আন্দোলনের বিজয় যেমন মুসলমানদের মনে আশার সৃষ্টি করেছে। তেমনি তাদের উপর নির্যাতন নবী রসূলদের সময়ের কথা যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মু'মিন মুসলমানদেরকে। বিশেষ করে মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। গণতন্ত্রের পতাকার ধারক বাহক বলে পরিচিত আমেরিকা! শুধুমাত্র ইসলামপন্থী দল হওয়ার জন্য মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো একটি জনগণের ভোটে নির্বাচিত দলকে বাদ দিয়ে নির্লজ্জের মতো সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করে।
তাদের সেই সমর্থনে ও ইসরাইলের মদদে মিশরীয় সেনাবাহিনী ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত গণহত্যায় মেতে উঠে। মুসলিম ব্রাদারহুডের কর্মীদের আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়া দেখে একদিকে অনেকের ঈমান যেমন উজ্জীবিত হয়েছে। তেমনি অন্যদিকে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যায় বিশ্বের সকল মানবতাবাদী মানুষদের চোখ অশ্রুসিক্তও হয়েছে।

মিশরীয় সেনাবাহিনীর এই অপকর্ম দেখেই যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বাংলাদেশে হাসিনার হায়েনা সরকার। দীর্ঘদিন ধরেই তারা সেখানকার ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দল বাংলাদেশ জামায়াতই ইসলামীর নেতা কর্মীদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। এবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশ বরেণ্য আলেম ওলামাদের উপর। যারা কখনও রাজনীতিতেই আসেনি। যারা ছিল সকল মুসলমানদের শ্রদ্ধার আসনে।

বাংলাদেশেও ইসলামের শিক্ষায় উজ্জীবিত তরুণ থেকে বৃদ্ধ সকলে সরকারী গুণ্ডা বাহিনী,পুলিশ বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর অস্ত্রের মুখে বুক পেতে দিয়েছেন। যেভাবে সকল প্রতিরোধ ভেঙ্গে তারা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন এবং জীবন দিয়ে শহীদ-ই জয় গান গেয়েছেন, তা বাংলার ইতিহাসে ইসলামের একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এখানে বিশেষভাবে হেফাজতের কর্মীদের এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের তরুণদের ত্যাগের কথা না বললেই নয়। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীরা মৃত্যুভয়কে জয় করে এবং সর্বোচ্চ কৌশল অবলম্বন করে দীর্ঘদিন ধরে রাজপথ দাপিয়ে বেড়িয়েছে। তাদের এই কর্মসূচী ইসলাম বিদ্বেষী সরকারকে যেমন কাঁপিয়ে দিয়েছে, তেমনি কাপিয়ে দিয়েছে পার্শ্ববর্তী সম্রাজ্যবাদী ভারত সহ বিশ্বের সকল ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিকে। একই

সাথে এই ছাত্র সংগঠনটি প্রশংসা এবং সমবেদনা যেমন পেয়েছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ,তেমনি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও তাদের কার্যকলাপে হয়েছেন মুগ্ধ। এমনকি দীর্ঘদিনের বাম ঘরনার বুদ্ধিজীবীগণও শিবিরের এই ত্যাগ, কর্মসূচী আর দলীয় শৃঙ্খলার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। বিভিন্ন টিভি চ্যানেল আর পত্রিকায় তাদের এই প্রশংসা জনগণের মাঝে নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে প্রবাস জীবনে থাকলেও নিজ দেশের মুসলমানদের উপর এই অত্যাচারে চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য। বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতা, মানবাধিকার সংস্থা, নিউজ মিডিয়া, প্রবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সহ আধুনিক সভ্যসমাজের নাগরিক হিসাবে বৈধ পন্থায় যা কিছু করা সম্ভব সবকিছুই আমরা করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ যতটুকু যোগ্যতা আর শক্তি দিয়েছিলেন তাই নিয়েই আমরা এগিয়েছি। এই কাজটি করতে যেয়ে একটি বিষয় আমাদের পরিষ্কার,আর তা হলোঃ বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের অধিকার সকল জাতির জন্য থাকতে পারে কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাহমুদুর রহমানের “মুসলমানদের মানবাধিকার থাকতে নেই” লেখাটির নির্মম বাস্তবতা আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেছি। এই পরিস্থিতিতে আমরা নিজেরাই যদি নিজেদের সাহায্য না করি,ত াহলে হয়তো বাংলাদেশ থেকেই ইসলাম একদিন মুছে যাবে। যে দিল্লী ছিল মুসলমান শাসকদের রাজধানী। যার স্মৃতিচিহ্ন দিল্লীর প্রতিটি ওলিতে গলিতে এখনও বিদ্যমান। সেই দিল্লীতে যেমন ইসলামের কথা এখন ভাবায় যায়না, তেমনি হয়তো একদিন বাংলার মাটি থেকেও ইসলাম চলে যাবে স্মৃতির যাদুঘরে।

পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের গভীর তাৎপর্য যদি গ্রাম বাংলার মানুষ বুঝত। এই পরাজয় যে আমাদের দুইশত বছরের গোলামীর গ্লানি বয়ে আনবে সেই উপলব্ধি যদি তাদের মাঝে আসতো। সর্বোপরি সেই পরাজয় সমস্ত উপমহাদেশে রাজার জাত হিসাবে পরিচিত মুসলমানগণ প্রজার জাতে রূপান্তরিত হবে, এই ধারণাটি তাদের মধ্যে জাগ্রত থাকত। তাহলে পলাশী প্রান্তরের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কৃষক, শ্রমিক আর গ্রামবাসী তাদের হাতের কাছে যা কিছু ছিল তাই নিয়ে ইংরেজদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসত। আর সত্যি সত্যি যদি এই প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো, তাহলে ইংরেজদের বিজয় তো দূরের কথা পালানোর জায়গা পর্যন্ত থাকতো না। বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা ঠিক তেমনই একটি পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই উপলব্ধিটা আসার এখনই সময়। এই উপলব্ধিটা এখনই বুঝতে না পারলে বাংলাদেশের জনগণের উপর নেমে আসবে এক মহাবিপর্যয়। যা হয়তো পলাশীর পরাজয়ের থেকেও হবে বেশী বেদনাদায়ক।

তাই এই অবস্থায় বাংলাদেশে যারা নির্মম অত্যাচার আর নিপীড়নে জর্জরিত তাদের পাশে দাঁড়ানো প্রতিটি প্রবাসী বাংলাদেশীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। নিজের পরিবারের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে আমরা যদি একটি পরিবারকেও সাহায্য করি,বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেটিও হবে অনেক বড় কাজ। নির্যাতিত এই মুসলমানদের সাহায্য করা এটিও হবে আল্লাহর পথে ব্যয়ের একটি অংশ। এই আহবানটি করতে যেয়ে আমি একটি বিষয়ে খুব অবাক হয়েছি। আর তা হলো,আল্লাহর পথে

ব্যয়ের জন্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ভুল ধারণা। আমি আরও অবাক হয়েছি ,এই ভুল ধারণা ধরিয়ে দেয়ার জন্য আজ পর্যন্ত বাংলায় কোন বই প্রকাশ হতে না দেখে। ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর উপর অনেক বই হয়তো আছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্র সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা আমরা সেখান থেকে পাইনা। তাই এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েই আমার এই লেখা।

বিষয়টি আমার জন্য এক কোথায় দুঃসাহস দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। আমার জানা মতে এই বিষয়ে কেউ কলম ধরেনি। ধরলে আমি অবশ্যই এই দুঃসাহস দেখাতাম না। কারণ এই লেখাটি লিখতে যেয়ে আমাকে আল কোরআনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। যে বিষয়ে আমি মোটেই যোগ্য নই বলে বিশ্বাস করি। তবে দীর্ঘদিন ধরে কোরআন ও হাদিসের অধ্যয়নের ফলে আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন তার সর্বোচ্চ ব্যাবহার করে এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথেই আমি এ কাজটি করার চেষ্টা করেছি। মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও বিখ্যাত তাফসীরগুলো থেকেই ব্যাখ্যা গুলো করার চেষ্টা করেছি। সাংঘর্ষিক কোন ব্যাখ্যাতে আমি যায়নি।   ভালো একটি উদ্দেশ্য নিয়েই আমি কাজটি করেছি। তাই আশাকরি ভুল হলেও দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। আর আমার ব্যাখ্যা নেয়ার বাধ্যবাধকতা তো পাঠকের নেই ! তাই তারা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন।

আমি লক্ষ্য করলাম অধিকাংশ মুসলমান মসজিদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত! ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ঠিক তার উল্টো! এটা শুধু ভুল ধারণায় নয়,আমি মনে করি মুসলমানদের আজ অধঃপতিত অবস্থার এটি একটি অন্যতম কারণও বটে। আজ সারা বিশ্বে মসজিদ নির্মাণে,পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারে মুসলমানগণ যেভাবে খরচ করছেন তার অর্ধেকও যদি আজ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে লিপ্ত দলগুলিকে দেয়া যেত!তাহলে হয়তো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের জয়গানের পতাকা উড়ত। এটি বললে ভুল হবেনা যে, একশটি মসজিদের চেয়ে একশ একর জমির উপর একটি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা বর্তমান প্রেক্ষাপটে উম্মাহর জন্য বেশী জরুরী। এই বিষয়টি যত দ্রুত মুসলমানগণ বুঝবেন ততো দ্রুত ইসলাম পৃথিবীর বুকে আবারও খেলাফতের পতাকা উড়াতে সক্ষম হবে। সেই বিশ্বাস থেকেই এই লেখাটি পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম। আল্লাহ আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে রসূল (সা:) যেভাবে তাঁর সাহাবীদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন,সেইভাবে ইসলামকে বোঝার তৌফিক দিন। আমীন।

সাইফুল্লাহ খালিদ
সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া

সূচীপত্র

ভূমিকা	৬
আল কোরআনের আলোকে আল্লাহর পথে ব্যয়	৯
ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'র সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা:)	২২
সাহাবীদের জীবনে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'র প্রভাব	২৫
হযরত সাদ ইবনে রাবী আল খাজরাজী আনসারী (রা:)	২৬
তাবুক অভিযান ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস	২৭
হযরত সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী (রা:)	২৯
হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ)	৩০
আল কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হুযায়ফা (রাঃ)	৩১
পরিশেষ	৩৩

ভুমিকা

আল্লাহর পথে অনেকেই দুই হাতে খরচ করেন। উদ্দেশ্য একটাই আল্লাহর সন্তুষ্টি। সারা পৃথিবীতে আজ যে লক্ষ লক্ষ মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, ইসলামী লাইব্রেরী, ইসলামী স্কুল, কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় সহ যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার একটি বৃহৎ অংশই মূলত গড়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের আল্লাহর পথে খরচ করার মানসিকতার জন্য। আজ পশ্চিমা বিশ্বে একের পর এক গির্জা বিক্রি হচ্ছে। যার অধিকাংশ মুসলিমগণ ক্রয় করে মসজিদ তৈরি করছেন। অনেক ইসলাম বিদ্বেষী এই অপপ্রচার চালায় যে, সৌদি আরবের পেট্রো ডলারের মাধ্যমে এগুলো কেনা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ভিন্ন। এই সকল মসজিদ তৈরিতে স্থানীয় সাধারণ মুসলমানগণ দুই হাত খুলে এমনভাবে খরচ করেন যে, মসজিদ কমিটির লোকজন পর্যন্ত তাদের এই মহৎ ত্যাগে হতবাক হয়ে যান। যারা বিভিন্ন মসজিদের সাথে জড়িত তাদের কাছে গেলেই এই ধরণের অভিজ্ঞতার অজস্র উদাহরণ আপনারা পাবেন।

মুসলমানদের এই ত্যাগ, এই কোরবানি নিঃস্বন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু সেই সাথে এখানে আরেকটি বিষয়ও গভীরভাবে ভেবে দেখার দাবী রাখে। সে বিষয়টি হলো, বর্তমান সমাজে সাধারণ মুসলমানগণ আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে কোন ক্ষেত্রটিকে বেছে নিচ্ছেন এবং কেন নিচ্ছেন? ইসলামের দৃষ্টিতে সেই ক্ষেত্রগুলো বা কারণগুলো সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়ার অধিকার রাখে কি'না? কোন খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিৎ সেই বিষয়ে অনেকেরই বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে। সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যেও এই বিষয়ে ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু আল-কোরআন,আল হাদিস,রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কর্মপদ্ধতি, সাহাবীদের জীবনে যদি আমরা কোন একটি বিশেষ খাতকে অথবা কারণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে দেখি, তাহলে আমাদের সকলের উচিৎ নিজেদের মতামত পরিহার করে সেই খাত অথবা কারণকে গুরুত্ব দেয়া।

মূলত: আমি সেই বিষয়টিই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আমি মনে করি প্রত্যেক ইসলামী নেতৃবৃন্দের উচিৎ এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া। আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য অনেক বই ও লেকচার আছে। বিভিন্ন ফান্ড রেইজিং প্রোগ্রামে নিয়মিত সেগুলো আলোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন খাতকে কখন এবং কেন প্রাধান্য দিতে হবে সেই বিষয়টি সাধারণ জনগণের সামনে কেন যেন কোন ভাবেই তুলে ধরা হয়না। এই বিষয়ে আলোচনা করার আগে প্রথমেই একটি বিষয়কে আমাদের সামনে আনতে হবে। আর তা হল সাধারণ জনগণ আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য সর্বপ্রথম কোন খাতটিকে প্রাধান্য দেয়। এই বিষয়ে সঠিক জরিপ কেউ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। এই বিষয়ে কোন গবেষণা হয়েছে বলেও আমরা কখনও শুনিনি। কিন্তু হওয়া উচিৎ ছিল বলে আমরা মনে করি। তবে মাঠ পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা এক বাক্যে একথা স্বীকার করবেন যে, এই বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রাধান্য পায় যে খাতটি, তা হল আল্লাহর ঘর অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণের জন্য।

পশ্চিমা বিশ্বে মসজিদ নির্মাণের জন্য ফান্ড রেইজিং ডিনারের প্রচলন রয়েছে। এই ধরণের ফান্ড রেইজিং ডিনারে যাওয়ার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা নিশ্চয়ই এটা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন যে, কিভাবে মানুষ এই খাতে দুই হাত খুলে খরচ করে। পশ্চিমা বিশ্ব ছাড়াও বিশ্বের সব জায়গাতেই দেখা যায়, মুসলমানগণ মসজিদ নির্মাণের জন্য দুই হাতে খরচ করেন। মুসলিম বিশ্বগুলোতে মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান, নির্মাণ সামগ্রী প্রদানের রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। এই বিষয়গুলো সামনে রাখলে একথা বললে ভুল হবেনা যে, আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বোৎকৃষ্ট খাত বা উপায় হিসাবে সাধারণ মুসলমানগণ আল্লাহর ঘর অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণকেই বুঝে।

মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের এই ত্যাগকে কোনভাবেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। মসজিদের এই খাত ছাড়াও আরও যে সকল খাতকে মুসলমানগণ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন, সেই খাতগুলো যেমন: ইয়াতীমখানা, মাদ্রাসা, মক্তব, ইসলামী সেন্টার ইত্যাদি কোনটিকেই ছোট করে ভাবা যায়না। কিন্তু আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য কোন খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিৎ? এই প্রশ্নে আমরা দেখতে পাই, সাধারণ মুসলমানদের বিবেচনায় সেই খাতটি হল মসজিদ। প্রশ্ন হল ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই খাতটি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কি'না? যদি না হয়, তাহলে আমাদের জানা উচিৎ সেই খাত কোনটি। সেই সাথে সকল ইমামদের, ইসলামী স্কলারদের এবং দায়িত্বশীল সকল মুসলমানদের দায়িত্ব হয়ে যায়, সাধারণ মুসলমানদের এই ভুল ধারণাকে সংশোধন করে দিয়ে সঠিক ধারণা প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সা:) সর্বপ্রথম যে মসজিদটি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ করেন, সেটি হল মসজিদে নববী। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) মদিনাতে প্রবেশের পূর্বেই কুবাতে অবস্থান করার সময় যেখানে জুম্মার নামাজ পড়েন, সেখানেও একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদে নববীর জমি ছিল দুইজন এতিমের যা আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করা হয়। আর এর নির্মাণ সামগ্রী মুসলমানগণ বাগান থেকে সংগ্রহ করেন। মসজিদ তৈরির জন্য মুসলমানগণ নিজেরাই শ্রম দেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:) পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেন। এভাবেই তৈরি হয় ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদ। মসজিদটি এতোটাই সাধারণ ছিল যে, বৃষ্টি হলে এর মধ্যে পানি পড়ত এবং মাটির মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে যেত। অনেক সাহাবীর সহীহ হাদিসেও বিষয়টি উঠে এসেছে। সাহাবীরা বলেছেন, তারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সেজদার জায়গায় অর্থাৎ কপালে কাদা লেগে থাকতে দেখেছেন।

প্রাথমিক অবস্থায় যেহেতু মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলনা সেই অবস্থায় হয়তো মসজিদের এমন জীর্ণদশা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু রসূল (সা:) যখন একের পর এক বিজয় লাভ করা শুরু করলেন, গণিমতের মাল যখন মুসলমানদেরকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করে তুলছিল। বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পর যখন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে চলে এসেছিল। চারদিক থেকে যাকাত আর জিজিয়ার অর্থ মদিনাতে আসা শুরু করেছিল তখন কি সেই অর্থ থেকে তিনি মসজিদে নববী সংস্কার করেছিলেন? ইতিহাস সাক্ষী তিনি তা করেননি। এমনকি আবু বকর সিদ্দীকের শাসনামলেও মসজিদে নববী তেমনই ছিল যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা:) রেখে

গিয়েছিলেন। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এর স্বর্ণালী শাসনামলে যখন রোমান ও পারস্য সম্রাজ্য মুসলমানদের পদতলে এসে গিয়েছিল, তখনই তিনি প্রথম মসজিদে নববী সংস্কার করেন। তাও সেটি আহামরি কিছু ছিলনা। উমাইয়া শাসক আল ওয়ালিদের সময় উমার ইবনে আবদিল আযীয (রহ) যখন মদিনার গভর্নর ছিলেন তখনই মূলত: মসজিদে নববী চাকচিক্যময় মসজিদে পরিণত হয়।

কিন্তু উমার ইবনে আবদিল আযীয (রহ) এই কাজটি করেছিলেন শুধুমাত্র গভর্ণর হিসাবে তাঁর খলিফার নির্দেশ পালনের জন্য। তাঁর সম্পর্কে শুধুমাত্র এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, রাসূল (সাঃ) এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা, মসজিদে নববীর মর্যাদা ও মুসলমানদের এই স্থানটির প্রতি যে গভীর আবেগ সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই কাজটি যেন ক্রুটিহীনভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেদিকে তিনি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর নিজের খেলাফতকালে তিনি মসজিদগুলোকে কারুকার্যময় করার দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত ছিলেন। তিনি যখন খলীফা তখন মদীনায় বানূ আদী ইবন আন-নাজ্জারের মসজিদটি ধ্বসে পড়ে। সেটি পুনঃনির্মাণের জন্য কাজী আবূ বকর ইবন হাযম খলীফা উমার ইবনে আবদিল আযীযের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র লেখেন। জবাবে তিনি লেখেন, আমার ইচ্ছা তো এই ছিল যে, একটি পাথরের উপর আরেকটি পাথর এবং একটি ইটের উপর আরেকটি ইট না রেখেই দুনিয়া থেকে চলে যাই। কিন্তু তা আর হলো না। আপনি কাঁচা ইট দিয়ে মধ্যম মানের একটি মসজিদ পুনঃনির্মাণ করে দিন। মসজিদের ব্যাপারে এটাই ছিল মুসলমানদের পঞ্চম খলীফা খ্যাত উমার ইবনে আবদিল আযীযের চিন্তা চেতনা।

তাহলে প্রশ্ন দাড়ায়, রসূল (সা:) কোন খাতে এই অর্থগুলো ব্যয় করতেন? আমরা জানি, আল-কোরআনে অসংখ্য জায়গায় মহান আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন, না দেয়ার পরিণতি জানিয়ে হুমকি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) তার জীবনেও অসংখ্যবার সাহাবীদের কাছে আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য আহবান জানিয়েছেন। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে আবু বকর সিদ্দিক, উসমান ইবনে আফফান, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা:) সহ অসংখ্য সাহাবীগণ আল্লাহর পথে ব্যয়ের অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে রেখে গেছেন। আল্লাহর পথে ব্যয়ের যে নজির সাহাবিগণ রেখে গেছেন ইসলামের ইতিহাসের পাতা আজও তার সুরভি ছড়ায়। প্রশ্ন হচ্ছে সাহাবীদের এই ইতিহাস সৃষ্টিকারী ত্যাগের অর্থ কোন খাতে ব্যয় করা হতো?
মূলত: এই উত্তরগুলো জানার আগে আমাদের জেনে নেয়া উচিৎ, আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কিভাবে আহবান জানিয়েছেন। সেই আহবানে স্বয়ং রসূল (সা:) কিভাবে সাড়া দিয়েছেন। এরপর আমরা জেনে নেব সাহাবীগণ এই আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সর্বশেষ আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব এই অর্থগুলো প্রকৃতপক্ষে কোন খাতে সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে ব্যয় করা হয়েছিল। আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে ভ্রান্ত-ধারণা থেকে মুক্ত করে সঠিক ধারণা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আল কোরআনের আলোকে আল্লাহর পথে ব্যয়

আল্লাহর পথে ব্যয়কে আল কোরআন একটি বিশেষ পরিভাষার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আর সেই পরিভাষাটি হল "ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ"। অর্থাৎ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ বলতে সেই অর্থ বুঝায় আল্লাহর পথে ব্যয় বলতে আমরা যা বুঝি। ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'র শাব্দিক অর্থ, পরিভাষাগত ব্যাপক অর্থ, এর গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা বিভিন্ন লেখক করেছেন এবং বিভিন্ন তাফসীরেও এসেছে। যেহেতু ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ নিয়ে খুব বেশী ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই এবং এর ক্ষেত্রগুলি নিয়েও খুব বেশী মতভেদ নেই, তাই এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে আমি বইয়ের কলেবর বৃদ্ধিতে আগ্রহী নই। আমি শুধু সেই বিষয়টিই তুলে ধরতে চাই, যে বিষয়টি বর্তমান সময়ের মুসলমানদের সাথে রসূল (সাঃ), তাঁর সাহাবিগণ, তাবেয়ী ও তাবে তাবেঈনদের সময়ের মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। আর সেই বিষয়টি হল, আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কোনটি? আমি মূলতঃ এই বিষয়টির মধ্যেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

সাধারণতঃ আল কোরআনের পরিভাষা গুলো ব্যাপক অর্থ বোধক হয়ে থাকে। যেমনঃ ইলাহ, রব, ইবাদত ইত্যাদি পরিভাষাগুলো এতো ব্যাপক অর্থ বোধক যে এই পরিভাষাগুলো নিয়ে এক একটি বই পর্যন্ত লেখা সম্ভব। এজন্য আমি মনে করি মুসলমানগণের উচিৎ এই পরিভাষা গুলোতেই অভ্যস্ত হওয়া। এই পরিভাষা গুলোর অনুবাদ করা উচিৎ নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, অনেকেই রহমানের অনুবাদ করে থাকেন দয়াময়। প্রকৃত সত্য হল এই যে, রহমান শব্দের একটি অর্থ দয়াময় এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এই শব্দটি শুধুমাত্র এই একটি অর্থই বহন করেনা। বরং এই শব্দটি ব্যাপক অর্থ বোধক। তাই আল কোরআনের পরিভাষাগুলো একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অনুবাদ না করাই ভালো বলে আমি মনে করি। ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ তেমনি একটি পরিভাষা যা ব্যাপক অর্থবোধক। তাই আমাদের উচিৎ এই পরিভাষার সাথে পরিচিত হওয়া। কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ পাঠক এই পরিভাষার সাথে পরিচিত নন, তাই সাধারণ সকলের বোঝার সুবিধার্থে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে "আল্লাহ'র পথে ব্যয়" কথাটি ব্যাবহার করতে একান্ত বাধ্য। তবে ক্ষেত্র বিশেষে আমি ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ কথাটিও ব্যাবহার করবো। আশাকরি পাঠকবৃন্দ বিষয়টি সহজভাবে গ্রহণ করবেন।

আসুন প্রথমে আল কোরআন "ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ" নিয়ে কি বলছে আমরা তা জেনে নিই। আশা করা যায়, আল কোরআনের এই আয়াতগুলো থেকেই ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'র অর্থ, তাৎপর্য, গুরুত্ব, ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আমরা একটি পরিপূর্ণ ধারণা লাভে সক্ষম হব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। **সূরা আনফাল ৬০**

মূলত: এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব তা সংগ্রহ করতে বলেছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত্রুর উপর প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এই নির্দেশ দিয়েছেন।এখানে অপ্রকাশ্য শত্রু বলতে মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অনেকসময় দেখা যায়, মুসলমানগণ যাদেরকে নিজেদের বন্ধু ভাবেন, যাদেরকে অনেক বড় আলেম মনে করেন, নাজুক পরিস্থিতিতে এরাই উম্মাহর বিরুদ্ধে দাড়িয়ে যায়। মুসলমানদের পক্ষে কখনই আগে থেকে এদের চেনা সম্ভব নয়। আর মূলতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই মুনাফিকদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এজন্য ইসলামের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে এই সকল মুনাফিক মুসলিম নেতা ও স্কলারদের মাধ্যমে। এজন্য আল্লাহ বলছেন তোমরা না চিনলেও আমি তাদের চিনি। তোমাদের এই প্রস্তুতি সেই অপ্রকাশ্য শত্রুদের উপরও প্রভাব ফেলে। আর প্রকাশ্য শত্রুদের উপরতো ফেলবেই।

শুধু যুদ্ধ শুরু হলেই যারা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ব্যয় করার কথা ভাবেন, তাদের সেই ভাবনাকে এই আয়াত ভুল প্রমাণ করেছে। যুদ্ধ শুরুর অনেক আগে থেকেই সাধ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগেই মুসলিমদেরকে এক পতাকাতলে আসার একটি সুযোগও সৃষ্টি করে দিয়েছেন এই আয়াতের মাধ্যমে।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ইসলামী দলগুলোর কাছে এই আয়াত বিশেষ চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশেই আমরা একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। সেখানকার জাতীয়তাবাদী দলগুলো অথবা তথাকথিত প্রগতিশীল দলগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি করলেও এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি করলেও ইসলামী দলগুলোর বিরুদ্ধে খুব দ্রুতই একজোট হয়ে যায়। ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। পশ্চিমা দেশগুলো নিজেরা একে অপরকে অবিশ্বাসের চোখেই দেখে। পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা গোয়েন্দাগিরি করতেও পিছপা হয়না। এমনকি দুই দুইবার তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত করেছে। কিন্তু যখনই

ইসলামপন্থীদের কোন বিষয় এসে যায়, তখন এরা খুব দ্রুতই এক সুরেই সূর মিলায়।
তাই ইসলামপন্থীদেরও উচিৎ ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সকল ইসলামী দলগুলোকে নিজেদের মধ্যকার ভেদাভেদ ভুলে একীভূত হওয়া। বিশেষ করে সংকটময় মূহুর্ত গুলোতে ছোট ছোট ইসলামী দলগুলোর উচিৎ সবচেয়ে বড় যে ইসলামী দলটি আছে সেই দলকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করা। আর বড় দলের উচিৎ বড়ত্বের পরিচয়ে ছোট দলগুলোর জন্য উদারতা দেখিয়ে কাছে টেনে নেয়া। এই সময়ে নিজেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সমালোচনায় লিপ্ত না হয়ে, ইসলামের শত্রুদের সমালোচনায় ব্যস্ত হওয়াটায় হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এভাবেই এই আয়াত থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিতে পারেন।

এই আয়াত থেকে আরও যে বিষয়টি বিবেচনায় আনা যায় তা হল এই যে, বর্তমান যুদ্ধে মিডিয়া একটি বড় মাধ্যম। তাই যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে মুসলমানগণকে এই সেক্টরকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।এখানে মিডিয়া বলতে শুধুমাত্র সংবাদ মাধ্যম,সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পেপার মিডিয়ায় নয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সাংস্কৃতিক মাধ্যমকেও বিবেচনায় আনতে হবে। এই সেক্টরে ব্যয়ের জন্য যখন মুসলমানদেরকে আহবান করা হয়, তখন এটাকেও মুসলমানদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রস্তুতি হিসাবেই দেখতে হবে এবং দুই হাতে খরচ করতে হবে।কারণ আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য খরচ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এভাবে যুদ্ধের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত সেক্টরগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেক্টরকে যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই। বর্তমানে মুসলমানদেরকে জঙ্গি, জঙ্গিবাদ অপবাদ দিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী মিডিয়াগুলো এমন একটি অবস্থা তৈরি করেছে যে, ইসলামের অনেক স্কলারগণ এখন এই বিষয়টা এড়িয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন। আর সাধারণ মুসলমানগণও এই ধরণের কোন বই পড়তে বা রাখতে আতঙ্ক বোধ করেন।

আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আপনারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে, তারা এই ব্যাপারে থেমে আছে কি'না? সবচেয়ে বেশী চিৎকার করা দেশ আমেরিকার সামরিক খাতের বাজেট এখনও বিশ্বের সকল দেশের উপরে। ইউরোপের দেশগুলো, চায়না, রাশিয়া, ভারত সহ অধিকাংশ দেশ তাদের বাজেটের সবচেয়ে বড় অংশ ব্যয় করে সামরিক খাতে। সুতরাং মুসলিম দেশগুলোও যদি সেটা করে তাহলে অন্যায়টা কোথায়? শুধু তাই নয়, আল কোরআনের আয়াত অনুযায়ী সকল মুসলিম রাষ্ট্রের এই খাতেই সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেয়া উচিৎ। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের কিছু দেশে সাংবিধানিকভাবে প্রত্যেক নাগরিকের সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়া বাধ্যতামূলক। অধিকাংশ মুসলিম দেশে এই আইনটি নেই। অথচ এই আয়াত অনুযায়ী, প্রত্যেক মুসলিম দেশে এই আইনটি সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক করা উচিৎ।

উপরের কথাগুলো যেমন সত্য, তেমনি তিক্ত বাস্তবতাও সেখানে রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোর সরকারই ইসলাম বিদ্বেষী। তারা সামরিক খাত ও পুলিশ সেক্টরের উন্নতি করলে সেটি ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সম্ভাবনা বেশী থাকে এবং বর্তমানে সেটা ব্যবহৃত হচ্ছেও। মিশর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, বাংলাদেশ সহ অসংখ্য দেশ তার নিকৃষ্ট

দৃষ্টান্ত। সেক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের উপর দায়িত্ব এসে যায়, এসব দেশের ইসলামপন্থী দলগুলোকে, যেগুলো সেদেশের সরকারের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত ভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা। এই সকল ইসলামী আন্দোলনকে আর্থিক এবং নৈতিক সমর্থনের মাধ্যমেই কেবল এই আয়াতের হক আদায় করা সম্ভব হতে পারে।। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এই আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলছেন: "বস্তুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" অর্থাৎ এই যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য আমরা আল্লাহর পথে যা ব্যয় করব আল্লাহ পরিপূর্ণভাবে তা ফিরিয়ে দেয়ার ওয়াদা করছেন এবং তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তিনি হক পরিপূর্ণ করবেন। যদিও এই কথাটি সার্বজনীন ভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সকল সময়ের, সকল কালের মুসলমানদের জন্য বলা হয়েছে। তারপরও এই আয়াতগুলি সর্বপ্রথম যে সময়ে এসেছিল, অর্থাৎ সাহাবীদের জীবনে এই আয়াত কিভাবে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল তা আমরা ইতিহাসের আলোকে একটু জেনে নিই।

মূলত: আরব জাতি রোমান ও পারস্য জাতির কাছে একটি অসভ্য এবং বর্বর জাতি বলেই পরিচিত ছিল। তারা এটাও জানতো যে, ক্ষুধার তাড়নায় এরা মাঝে মাঝে তাদের সীমান্ত শহর গুলোতে আক্রমণ করতো। বেদুঈনদের এই আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে পারস্য সম্রাট একবার একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন আরব উপদ্বীপে। দীর্ঘদিন এই বাহিনী আরবের মরুভূমির মধ্যে ঘুরেছে কিন্তু বেদুঈনদের কোন সন্ধানই পায়নি। তারা চিন্তা করলো এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারের যে খরচ হবে তার থেকে এদের যে চাহিদা!সেটা পূরণ করাই অনেক বেশী সাশ্রয়ী । ফলে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, তারা আরবের এই বেদুঈনদের বছরে একবার করে কিছু কাপড় আর খাবার বিনামূল্যে প্রদান করবে। বিনিময়ে বেদুঈনগণ তাদের সীমান্তে কোন আক্রমণ করবেনা। এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে তারা এক ধরণের অঘোষিত চুক্তিতে আবধ্য ছিল। রোমানগণ আগেই এধরণের একটি বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। এর মাধ্যমে আরবদের সাথে পারস্য ও রোমানদের একটি মিত্রতা তৈরি হয়েছিল। এমনকি আরবরা তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যও শুরু করেছিল। তাদের সাথে মেলা মেশার মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, ক্ষুধার তাড়নায় এরা মাঝে মাঝে মৃত খরগোশের গোশতও খায়। একারণেই মুসলমানগণ যখন রোমান ও পারস্যদের আক্রমণ করে,তখন বেশ কয়েকবার এই ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্নটি শুনতে পাই যে,"তোমরা কি তারা নও যারা মৃত খরগোশের গোশত খাও?"এতোটাই অভাবী জাতি ছিল এই আরব জাতি। আন্তর্জাতিকভাবে তারা একটি দরিদ্র জাতি বলে পরিচিত ছিল।

এই জাতির মধ্য থেকেই মুসলিম মুহাজিরগণ যখন মদিনাতে পৌঁছান তখন তারা আরও নিঃস্ব হয়ে যান। তাদের মধ্যে যারা সচ্ছল ছিল তারাও কপর্দকহীন অবস্থায় মদিনায় পৌঁছান। আর মদিনার আনসারগণ ছিলেন কৃষক। তারা মুহাজিরদের থেকেও ছিলেন গরীব। হাতে গোনা কয়েকজন আনসার সাহাবী ছিলেন ধনী ব্যক্তি। মূলত: মদিনার ইহুদীরা ছিল ধনবান। এই গরীব আনসারগণ মুহাজিরদের সাহায্য করতে যেয়ে হয়ে পড়েছিলেন আরও গরীব। তবে অল্পদিনের মধ্যেই তারা একটু সচ্ছল হয়ে উঠেন রসূল (সা:) এর বরকতয় উপস্থিতির জন্য।

এমন অবস্থায় আল্লাহ তাদের কাছে আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য আহবান জানালেন। আর সাহাবিগণ এই আহবানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলেন। দেখুন আল্লাহ কিভাবে তাদের আল্লাহর পথে ব্যয়কে ফিরিয়ে দিলেন এবং পরিপূর্ণ হক আদায় করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রোমান আর পারস্যদের সমস্ত জমি আর সম্পদ আল্লাহ তাদের পায়ের নীচে এনে দিলেন। এক সময়ের সবচেয়ে অভাবী জাতিটি আজ বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দুই সম্রাট ও তার জনগণের সকল সম্পদের মালিক। এভাবেই আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পরিপূর্ণভাবে পালন করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়াদা পালনকারী। ভবিষ্যতেও কোন জাতি যদি আল্লাহর এই আহবানে একইভাবে সাড়া দেন, আল্লাহ তাদেরকেও একইভাবে দান করবেন যা তারা ভাবতেও পারবেনা। এটাই আল্লাহর ওয়াদা।

একারণেই অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আল্লাহর পথের এই ব্যয়কে ব্যয় না বলে বলছেন এটা এক ধরণের ব্যবসা। ব্যবসায় যেমন ব্যবসায়ীরা টাকা লগ্নি করে বিপুল মুনাফার আশায়। আল্লাহ বলছেন আল্লাহর রাহে ব্যয়টিও তেমনি। ব্যয় বা খরচ বলতে আমরা বুঝি কোন সেবা পাওয়ার জন্য আমরা যে অর্থ ব্যয় করি সেটা। যেমন আমরা টেলিফোন বিল,বিদ্যুৎ বিলের জন্য ব্যয় করি।বিমানের ফার্স্টক্লাস টিকিট কেনা হয় আরও উন্নত মানের সেবার জন্য। অর্থাৎ সেবার বিনিময়ে আমরা যে অর্থ দিয়ে থাকি এটাই খরচ অথবা ব্যয়। পক্ষান্তরে আমরা যখন আমাদের কোন ব্যবসার জন্য অর্থ দিয়ে থাকি, সেখান থেকে আমরা সেবার আশা না করে মুনাফার আশা করে থাকি।

আল্লাহ তায়ালা এই দুইটি অর্থকেই গ্রহণ করেছেন। মজার বিষয় হল আমাদের সমাজে যে,মসজিদের জন্য দান করুন,মুক্ত হস্তে দান করুন কথাগুলি প্রচলিত আছে, আল্লাহ কোথাও এভাবে দানের কথা বলেননি। দান হল তাই যা আপনি বিনা স্বার্থে, বিনা শর্তে করুণা করে কিছু প্রদান করেন বিনিময়ে কিছুই চান না বা পান না। কিন্তু আমরা দেখলাম উপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করছেন আল্লাহর পথে ব্যয় করলে আল্লাহ তার থেকেও উত্তম প্রতিদান দিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছি আল্লাহ কিভাবে সেই ব্যয়ের প্রতিদান দিয়েছিলেন।এবার আসুন আমরা জেনে নিই আল্লাহর পথে ব্যয়কে আল্লাহ কিভাবে ব্যবসার সাথে তুলনা করছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

হে ইমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। **সূরা: ৬১ আস ছ'ফ আয়াত: ১০-১১**

এখানে আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মূল ভিত্তির প্রতি অর্থাৎ আখেরাতের বিশ্বাসের দিকে ইঙ্গিত করছেন। পরকালীন জীবনে আমরা জান্নাতের চির শান্তি অথবা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাবে নিপতিত হব বলে বিশ্বাস করি। আল্লাহ বলছেন আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি নিজেদের মাল এবং জান দিয়ে তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দিবেন জাহান্নামের সেই ভয়াবহ শাস্তি থেকে। এবং এটাই আমাদের জন্য হবে সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্য যদি আমরা বুঝি। এটা কতো লাভজনক হবে সেটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ আল কোরআনের অন্যত্র বলছেন,

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান। **সূরা: ১৩ আর রাদ আয়াত: ১৮**

অর্থাৎ এই ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সেদিন সমস্ত কিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে। তাদের কাছে যদি এই জগতের সব কিছু থাকে এবং তার সাথে এর সমপরিমাণ আরও কিছু থাকে, আর এই সবকিছুর বিনিময়ে যদি সে শুধু নিজের মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পাই, তাহলে সে এই সবকিছু মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দিতে রাজি থাকবে। কিন্তু সেদিন তার কাছ থেকে কোন বিনিময়ই আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ সেই ভয়াবহ শাস্তি থেকে সে কোনভাবেই মুক্তি পাবেনা। তাই আল্লাহ বলছেন, আল্লাহর পথে এই ব্যয় মানুষের জন্য লাভ জনক। কারণ এখন সে তার এই সামান্য সম্পদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করার মাধ্যমে আখেরাতের সেই কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাবে। যেই আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ তার সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে অথচ আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। তাই মানুষের উচিৎ এই লাভজনক ব্যবসাটি এখনই করে ফেলা। আল্লাহর পথে ব্যয়ের বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেন:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। **সূরাঃ ৫৭ আল হাদীদ ১১**

আল্লাহর পথে ব্যয়কে আল্লাহ তায়ালা লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ বলার সাথে সাথে এটিকে ধার হিসাবেও তুলে ধরেছেন। মানুষ সাধারণত: দ্রুত ফল লাভে বিশ্বাসী। কিন্তু ব্যবসাতে বিনিয়োগ করলে লাভ আসতে একটু দেরী হয়।এটাই স্বাভাবিক। আর তাই মানুষ আল্লাহর পথে ব্যয় করে আখেরাতের পুরস্কারের জন্য ধৈর্য ধরে থাকতে নাও পারে। যদিও সেই পুরস্কারই সর্বোত্তম। কিন্তু তারপরও রব্বুল আল আমিন, মানুষের প্রতি অতি মেহেরবান হয়ে এটিকে ধারের সাথেও তুলনা করেছেন।

সাধারণত: মানুষ ধার দেয় কাছের মানুষকে। আর ধার দেয় কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে। প্রথমত: এই ধার ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সম্পূর্ণভাবে। দ্বীতিয়তঃ এই ধার সে তার প্রয়োজনীয় সময়ে ফেরত পেলে খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়। কারণ এই ধারের সম্পদটি তার কাছে থাকলে খরচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তৃতীয়ত: এই ধারের কারণে সে তার সেই কাছের মানুষটির সাথে সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে সক্ষম হয়। এই সকল কারণে মানুষ দান করার চেয়ে ধার দিতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আল্লাহ তায়ালা যেন এই সকল বিষয়কে বিবেচনা করেই আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে উত্তম ধার হিসাবে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন আখেরাতের সম্মানজনক পুরস্কার তো থাকবেই সেই সাথে দুনিয়াতেও এই ধার আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দিবেন। সাহাবীদের জীবনীর দিকে দৃষ্টি দিলেও আমরা দেখতে পায় তারা ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে হৃত দরিদ্র। আর আল্লাহর পথে ব্যয় করার কারণে তাদের অধিকাংশই জীবনের শেষদিকে ছিলেন অঢেল সম্পত্তির মালিক। যদিও তারা দুই হাতে সেই সম্পদ ভালো কাজে ব্যয় করতেন।

এই সকল কারণে আল্লাহ তায়ালা বিষ্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, মানুষ কেন আল্লাহর পথে খরচ করতে ভয় পায়। অথচ এই সকল সম্পদ, এই নভোমন্ডল ও ভূ মণ্ডল সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তায়ালা এজন্য বিস্ময়ের সাথে বলেন,

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلِلَّـهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّـهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। **সূরা আল হাদীদ ১০**

আল্লাহর পথে ব্যয়ে মানুষের দ্বিধা করতে দেখে আল্লাহ যেমন বিষ্ময় প্রকাশ করেছেন তেমনি সেই সাথে তিনি এটিও জানিয়ে দিয়েছেন যারা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহর পথে ব্যয় করবে তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে তাদের থেকেও বেশী হবে যারা বিজয়ের পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে এবং যুদ্ধ করবে। অর্থাৎ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা রত এবং এই সংগ্রামের যারা পৃষ্ঠপোষক, তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে ইসলামী সমাজের একজন মুজাহিদ এবং সেই মুজাহিদদের পৃষ্ঠপোষকদের থেকে বেশী।

আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য এভাবে যেমন উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তেমনি ব্যয় যেন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা কিছু শর্তও তুলে ধরেছেন। আল্লাহ জানেন মানুষের অন্তর কি বলে? কারও উপকার করলে মানুষ সেটা বলতে বা খোটা দিতে অভ্যস্ত। তাই আল্লাহর পথে ব্যয় যে সে ধরণের নয়, বরং গোলাম তার নিজের উপকারের জন্য তার মালিককে নিবেদন করছে সেটি পরিষ্কার করার জন্যই এই শর্ত। আল্লাহ বলেনঃ

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। **সূরাঃ ২ আল বাকারাঃ ২৬২**

এ বিষয়ে আল্লাহ তা"য়ালা আরও বলেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

হে ঈমানদারগণ!তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। **সূরাঃ২ আল বাকারা ২৬৪**

কেন এই শর্ত সেটাও আল্লাহ তুলে ধরেছেন অন্য একটি আয়াতে

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপাকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরাপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। **সূরা ২ আল বাকারাঃ ২৭২**

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন,আল্লাহর পথে আমাদের এই ব্যয় মূলতঃ আমাদের নিজেদের উপকারার্থে। তাই আল্লাহর পথে এই ব্যয়কে আমরা যেন যথাসম্ভব গোপন রাখি এবং কষ্ট না দিই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,অনেকেই বলে থাকেন ভাই আপনাদের সংগঠনের জন্য তো অনেক দিয়েছি আর কতো? কেউ আবার বলেন,প্রচুর দিলাম লাভ হল কই? সাধারণতঃ এই কথাগুলোকে আমরা খুবই হালকা ভাবে চিন্তা করে বলি। কিন্তু উপরের আয়াত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে,এধরণের কথার জন্য আমাদের সমস্ত ত্যাগ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এ ধরণের কাজকে লোক দেখানো দানের সাথে তুলনা করে আল্লাহতা'য়ালা সেই দানকে মূল্যহীন ঘোষণা করেছেন। বিষয়টি বোঝার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা অসাধারণ উপমা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, মসৃণ পাথরের উপরে অল্প কিছু মাটি লেগে থাকলে, প্রবল বৃষ্টিতে যেমন সেই মাটি সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে যায়। আল্লাহর পথে ব্যয়ের পর সেই দানকে প্রকাশ করা অথবা সেই বিষয়ে কষ্ট দেয়ার অর্থ সেই দান একেবারে মূল্যহীন হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে সেই দান কোনভাবেই গ্রহণীয় নয়। কাজেই আল্লাহর পথে ব্যয়কে মনের গভীর থেকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রেখে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশায় করতে হবে। উপরের আয়াতে আরও একটি গভীর চিন্তার বিষয় আল্লাহ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহর পথে ব্যয় করা না করার সাথে সৎপথে পরিচালিত হওয়া না হওয়ার তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তারা আল্লাহ প্রদত্ত সৎ পথে পরিচালিত হয়না। অন্য আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "তিনি কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" বিষয়টি কতো সাংঘাতিক তা যেন, প্রত্যেক মু'মীন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) একবার কিছু মুদ্রা আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য তাঁর একজন আত্নীয়কে দায়িত্ব দেন। সেই আত্নীয় বিষ্ময়ের সাথে খেয়াল করেন যে, মুদ্রাগুলোতে সুগন্ধ বের হচ্ছে। তিনি আয়েশা (রাঃ) কে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি তো এগুলো দিচ্ছি স্বয়ং আল্লাহকে। তাই এগুলোর প্রতি আমি বিশেষ যত্ন নিয়ে থাকি এবং এগুলোতে সুগন্ধ মাখায় যেন আল্লাহ তা'য়ালকে খুশী করতে পারি। দানের বিষয়ে প্রত্যেক মু'মীনকে এমন যত্নবান হতে হবে।

শুধু তাই নয় বিষয়টি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহর পথে ব্যয়ে যেন আমরা আমাদের উচ্ছিষ্ট,

অনুকম্পা, না দিলেই নয়, তাই দিলাম এমন মনোভব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি, সেজন্যও আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাব মুক্ত, প্রশংসিত। **সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৭**

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

তোমরা কখনো সত্যনিষ্ঠ হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ব্যয় করো যা তোমরা ভালোবাস তা থেকে। আর তোমরা যে বস্তুই খরচ করবে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সে-সম্বন্ধে সর্বজ্ঞাতা। **সূরাঃ ৩ আল ইমরান, আয়াত ৯২**

উপরের দুইটি আয়াত এবং আলোচিত আরও কিছু আয়াত থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে উঠে এসেছে তা হল এই যে, আল্লাহর পথে এই ব্যয় আমরা আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য করছি। অন্য কারও জন্য নয়। তাই আল্লাহর রাস্তায় এই ব্যয় অত্যন্ত যত্নের সাথে করতে হবে এবং মোহাব্বত নিয়ে করতে হবে। আশংকা নিয়ে, দুরুদুরু বুকে, কাঁপা হাতে এমনভাবে প্রদান করতে হবে যে, মহামান্য বাদশাহ আমার মতো নগণ্য ব্যক্তি থেকে যদি এই সামান্য উপহার টুকু গ্রহণ করেন তাহলেই আমি ধন্য হয়ে যায়। গৃহীত না হলে আমার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলছেন:

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। **সূরাঃ ২ আল বাকারা ১৯৫**

অর্থাৎ আল্লাহর পথে খরচ না করলে আমরা নিশ্চিত ভাবেই ধ্বংসের সম্মুখীন হব বলে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি এটাও জানেন কেন মানুষ আল্লাহর পথে খরচ করতে ভয় পায়। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেন:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সু-বিজ্ঞ। **সূরা ২ আল বাঁকারা, আয়াত ২৬৮**

অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা থেকে যে কারণে আমরা বিরত থাকি, আল্লাহ বলছেন সেটা আসলে শয়তানের ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যেন এই ধোঁকায় পড়ে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ে ব্যয় করা থেকে বিরত না থাকি। শুধু তাই নয়, আল্লাহ আমাদের সংকীর্ণতা পরিহার করার জন্য উৎসাহিতও করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। **সূরা ৫৯ হাশর, আয়াত ৯**

এছাড়া যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা আল্লাহ তায়ালা তাদের অবস্থাও তুলে ধরেছেন:

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

আবার কোন কোন বেদুইন এমন ও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক।

আর আল্লাহ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। **সূরা ৯ আত তাওবা, আয়াত ৯৮**

মুমিনদের অবস্থা যেন এমন না হয়, সেজন্যই আল্লাহ এই চিত্রটি তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর পথে ব্যয় না করার পরিণতিও আল্লাহ তায়ালা তুলে ধরেছেন সূরা মুহাম্মদে –

هَا أَنتُمْ هَـٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿٣٨﴾

শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাব-মুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না। **সূরা ৪৭ মুহাম্মদ, আয়াতঃ ৩৮**

এরপর আল্লাহ সাবধান করছেন তাদেরকে যারা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে জমা করে রাখে। সূরা আঁত তওবার ৩৪ নং আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেন: আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তায়ালা এই ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে জোড় তাগাদা দিয়ে বলছেন এমন যেন না হয়, এই ব্যয়ের আগেই মৃত্যু আমাদের কাছে পৌঁছে গেলো। আল কোরআনে এসেছে:

مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। **সূরা ৬৩ মুনাফিকুন, আয়াতঃ ১০**

এই ধরণের হুমকির পাশাপাশি আল্লাহর পথে ব্যয়ে কি ধরণের লাভ হবে সেটিও তুলে ধরা হয়েছে এক অনন্য সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। **সূরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২৬১**

অন্য একটি আয়াতে বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। **সুরা ২ আল বাকারা, আয়াতঃ ২৬৫**

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানুতায়ালা এই ব্যয়ের বিনিময় দিবেন অগণিত। আসুন সেই অগণিত পুরস্কারের জন্য আমরা নিজেদের প্রস্তুত করি। সেই সাথে আমরা জানার চেষ্টা করি এই আয়াত গুলোর প্রভাব স্বয়ং এর মহান প্রবর্তকের উপর কিভাবে পড়েছিল এবং সেই সাথে এটাও জানার চেষ্টা করি যে, সাহাবীগণ এই আয়াতগুলোর কিভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'র সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা:)

রসূল (সা:) এর চরিত্র কেমন ছিল? এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) বলেছিলেন, তোমরা কি কোরআন পড়নি? অর্থাৎ আল কোরআনের বাস্তব রূপ ছিলেন মহান নবী, মহান রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা:)। এই হাদিসটি কম বেশী সকলের জানা।কিন্তু কখনও কি আমরা এই বিষয়টি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি? আসুন আজ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয়ের উপর আল কোরআনের যে আয়াত গুলো তুলে ধরা হয়েছে সেই আয়াত গুলোর সাথে রসূল (সা:) এর জীবনীকে আমরা মিলিয়ে দেখি।

রসূল (সা:) তরুণ বয়সে সকলের নিকট আমানতদার,সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। একারণে তাঁকে "আল আমীন" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর খাদিজাতুল কুবরা নিজের ব্যবসায়ের দায়িত্ব এই মহান মানুষটির উপর অর্পিন করলে সেখানেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হন। এভাবে তিনি শুধুমাত্র সৎ ব্যক্তি হিসাবে নয় বরং সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পান।এমন একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি যখন খাদিজাতুল কুবরার ন্যায় পবিত্র ও বুদ্ধিমতী ব্যবসায়ী মহিলাকে বিয়ে করেন তখন তাদের পাহাড়সম সম্পদ পর্বতসম হয়ে উঠবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা দেখতে পাই,এই দম্পতি তাদের সেই সম্পদকে বৃদ্ধি না করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এমনভাবে ব্যয় করতে থাকেন যেন এটি ছিল একটি বরফের পাহাড়! যা প্রচণ্ড রোদে শুধু গলে গলেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

তাঁরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে তাদের এই সম্পত্তি এমনভাবে ব্যয় করেন যে,হযরত খাদিজা (রা:) ইন্তেকালের কিছু পরেই যখন রসূল (সা:) হিজরত করেন,তখন হিজরত করা বা সফর করার জন্য বাহন কেনার মতো অর্থও তাঁর কাছে ছিলনা। তাইতো আবু বকর সিদ্দিক (রা:) যখন বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:) আমি আপনার ও আমার জন্য এই দুইটি উট কিনে রেখেছি। তখন রসূল (সা:) বলেন,যখন আমার হাতে অর্থ আসবে তখন আমি তোমার উটের মূল্য পরিশোধ করব। এমনকি সফরের খরচ চালানোর মতো অর্থও তাঁর কাছে ছিলনা। তাইতো আবু বকর সিদ্দিক সমস্ত সফরের খরচ বহন করেন।এভাবে এই মহান ব্যক্তিটি মক্কা ত্যাগের পূর্বেই আল্লাহর পথে ব্যয়ের যে আয়াতগুলো রয়েছে তার সর্বোত্তম হক আদায় করে ফেলেন। এক সময়ের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শিল্পপতি নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় মক্কা থেকে মদিনা গমন করেন।

মদিনা জীবনে প্রথম দিকে সমস্ত মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা গণিমতের মালকে মুসলমানদের জন্য হালাল করলে সচ্ছলতা আসা শুরু করে। কিন্তু মানবতার মুক্তিদুত এই মহামানবটি এই সকল অর্থ দুইহাতে বিতরণ করতে থাকেন। বুলেটফ্রুপ জ্যাকেট পড়া একজন ব্যক্তিকে গুলি করলে যেমন একটি গুলিও তার গায়ে ঢুকেনা। বরং

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি এই মানুষটির কাছে আসা সমস্ত অর্থই চলে যায় অন্যের ঘরে। নিজের ঘরের দিকে কিছুই পৌছায় না।

দারিদ্রতার নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত উম্মাহতুল মু'মীনিনগণ এক পর্যায়ে ভরণ পোষণের নূন্যতম দাবী পূরণের জন্য প্রতিবাদ আন্দোলন পর্যন্ত করতে বাধ্য হন। কিন্তু নিজের নীতিতে অটল এই মহান মানুষটি স্ত্রীদের এই ন্যায্য অধিকারটুকুও দিতে অস্বীকার করেন। এক পর্যায়ে একমাস পর্যন্ত সমস্ত স্ত্রীদেরকে বয়কট করেন। এমনকি একথা পর্যন্ত রটে যায় যে,তিনি সমস্ত স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় নেই।পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। **সূরা ৩৩ আহযাব, আয়াত ২৮ - ২৯**

অর্থাৎ সচ্ছলতা আর আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকে একসাথে পাওয়া যাবেনা। রাসূলুল্লাহ (সা:) আল কোরআনের আয়াতের এই প্রস্তাব সর্বপ্রথম আয়েশা সিদ্দিকার কাছে রাখলেন এবং কয়েকদিন সময় নিয়ে ভেবে উত্তর দিতে বললেন। আয়েশা সিদ্দিকা সময় নেয়া তো দূরে থাক,ভাবতে পর্যন্ত অস্বীকার করেন এবং বলেন আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকেই গ্রহণ করলাম। অন্যান্য স্ত্রীগণও একইভাবে আয়েশাকে অনুসরণ করেন। অর্থাৎ নবী পত্নীগণ স্বেচ্ছায় হাসিমুখে এই দারিদ্রতা মেনে নেন। যদিও নবী পত্নীগণ ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের কন্যা। অভাব যাদের ধারে কাছেও ছিলনা। সর্বোপরি সে সময় তারা ছিলেন মদিনার শাসকের স্ত্রী। এমন অবস্থা মেনে নেয়া শুধু নবী পরিবারের স্ত্রীদের পক্ষেই সম্ভব।

এভাবে রসূল (সা:) এর গোটা জীবনকে যদি আমরা তুলে ধরি তাহলে দেখতে পাব যে,সারা পৃথিবীকে আলোকিত করতে যে মানুষটি পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করেছিলেন,সেই মানুষটির নিজের ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর তেল পর্যন্ত থাকতনা। এমনকি তাঁর চুলার আগুনও জ্বলতোনা দীর্ঘ সময়। সমগ্র পৃথিবীকে সব কিছু দিয়ে রিক্ত হস্তে

তিনি চলে গেলেন মহান প্রভুর কাছে। এভাবেই আল্লাহর পথে ব্যয়ের যে আয়াতগুলো রয়েছে তার সবচেয়ে সার্থক উদাহরণ তিনি রেখে গেলেন নিজের জীবনে।

মৃত্যুর পূর্বে জানিয়ে গেলেন নবীদের উত্তরসূরি থাকেনা। অল্পকিছু স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে থেকে যাওয়া জিনিষপত্রের দাবী যখন আসল তার একমাত্র জীবিত থাকা মেয়ে ফাতিমা ও চাচা আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের কাছ থেকে। সেই দাবীও রাখা হলো না এই হাদিসটির কারণে। যদিও খলিফাতুর রসূল আবু বকর সিদ্দিকের পক্ষে রাসূল (সাঃ) এর প্রিয়তমা কন্যার এই আবেগ জড়িত দাবীকে উপেক্ষা করা ছিল খুবই কষ্টের। তারপরও তিনি সেগুলো তাদের হাতে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর এই পবিত্র ও স্মৃতিবিজড়িত জিনিষগুলো বায়তুল মালে জমা করেন সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিতরণের জন্য। এভাবে মৃত্যুর পরেও তিনি আল্লাহর পথে ব্যয়ের আয়াতগুলোর সার্থকতা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।

সাহাবীদের জীবনে
ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'র প্রভাব

হযরত সুহাইব ইবনে সিনান আর রুমী (রা:)

রসূল (সা:) যেমন সম্পূর্ণ শূন্য হাতে মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেছিলেন হযরত সুহাইব ইবনে সিনান আর রুমী (রা:) ও একই ভাবে সমস্ত সহায় সম্পত্তি ত্যাগ করে মদিনাতে হিযরত করেন। হযরত সুহাইব ইবনে সিনান আর রুমী (রা:) কে কোরায়েশরা হিজরত করতে বাধা দিলে তিনি জানতে চান কেন তারা তাঁকে বাধা দিচ্ছে? জবাবে কুরাইশদের একজন বললোঃ তুমি জীবনও বাঁচাবে এবং অর্থ সম্পদও নিয়ে যাবে তা আমরা হতে দেব না। তুমি মক্কায় এসেছিলে শূন্য হাতে। এখানে এসেই এসব সম্পদের মালিক হয়েছ।

সুহাইব বললেন,আমি যদি আমার ধন সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দিই,তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে দেবে? তারা বলল,হ্যাঁ। তিনি তাদের নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন এবং তাঁর সমস্ত ধন সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিলেন। এমনকি তাঁর কিছু গুপ্ত সম্পদও ছিল, যেগুলো অন্য কেউ জানতোনা। তিনি সেই সম্পদ গুলোও বের করে তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিঃস্ব,রিক্ত অবস্থায় খুশী মনে হিজরত করলেন।

রসূল (সা:) তখনও হিজরত করে মদিনায় পৌঁছাননি। তিনি কুবাতে অবস্থান করছিলেন। সুহাইব (রা:) কুবাতে এসে রসূল (সা:) এর সাথে মিলিত হলেন। রসূল (সা:) তাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠেন,আবু ইয়াহিয়া,ব্যবসা লাভজনক হয়েছে। তিনবার তিনি কথাটি বলেন। সুহাইব অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেন,আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ!আমার আগে তো আপনার কাছে আর কেউ আসেনি। নিশ্চয় জিবরাঈল এ খবর আপনাকে দিয়েছে। তাদের এই কথোপকথনের মাঝেই জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে হাজির হলেন। এখানে আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

"মানুষ এমনও আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবনও বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।" **সূরা ২ আল বাকারা, আয়াতঃ ২০৭**

হযরত সাদ ইবনে রাবী আল খাজরাজী আনসারী (রা:)

যদিও মদিনার আনসারগণ ছিলেন গরীব। কিন্তু তারা মুহাজিরদের জন্য উদারতার সর্বোচ্চ নজীর স্থাপন করেছিলেন। রসূল (সা:) তাদের সাথে মুহাজিরদের ভাতৃত্ব সম্পর্ক তৈরি করে দিলে তাঁরা এই সকল ভাইদের জন্য থাকা, খাওয়া ও জীবন ধারণের সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার প্রদান করেন। তবে এই বিষয়ে সাদ ইবনে রাবী এক বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেন।

রসূল (সা:) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা:) কে তাঁর দ্বীনি ভাই বানিয়ে দিলে তিনি তাঁকে প্রথমেই তার বাগানে নিয়ে যান। তিনি বলেন, হে আমার ভাই আনসাররা সকলেই জানে আমি একজন ধনী ব্যক্তি। এই আমার সম্পদ। আমি চাই আমার এই সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করতে। এর মধ্যে যেই ভাগ আপনার পছন্দের আমি সেটি আপনাকে দিয়ে দিতে চাই। এরপর তিনি তাকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন এই আমার দুই স্ত্রী। যে স্ত্রীকে আপনার পছন্দ আমি তাকে তালাক দিতে চাই, যেন আপনি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা:) বলেন, ভাই আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিজনের মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দান করুন। আমার এগুলোর কোনই প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু আমাকে বাজারটি দেখিয়ে দিন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই বাজারে ব্যবসা করেই আব্দুর রহমান ইবনে আওফ সমগ্র আরবের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হন। এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে সর্বোচ্চ প্রতিদান প্রদান করেছিলেন।

তাবুক অভিযান
ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) তাবুক অভিযানে আল্লাহর পথে ব্যয়ে আবু বকর সিদ্দিক (রা:) কে হারিয়ে দেয়ার সংকল্প করেন। তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি দুই ভাগ করে অর্ধেক রসূল (সা:) এর সামনে হাজির করেন। রসূল (সা:) জিজ্ঞাসা করলেন পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছ কি? তিনি বললেন,অর্ধেক ইয়া রাসূলুল্লাহ। এরপর আবু বকর সিদ্দিক (রা:) আসলেন এবং তার সম্পদ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সামনে পেশ করলেন। রসূল (সা:) জানতে চাইলেন,কিছু রেখে এসেছ তো? তিনি বললেন,আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলই যথেষ্ট। অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেন,এমনকি তিনি একটি সুই পর্যন্ত রেখে আসেননি। ওমর ইবনে খাত্তাব বিষ্ময় প্রকাশ করে বলেন,ভালো কাজে আমি কখনই আবু বকরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি।

তাবুক অভিযানে সর্বোচ্চ ব্যয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে যান হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা:)। তিনি প্রথমে কোরচে করে এক হাজার দীনার এনে রসূল(সা:) এর কোলে ঢেলে দেন। রসূল (সা:) খুশীতে দীনারগুলি উলটে পাল্টে দেখেন এবং বলেন, আজ থেকে উসমান যা কিছুই করবে,কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবেনা। তিনি উসমানের আগে পিছের সকল গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করেন এবং জান্নাতের ওয়াদা করেন। উসমান (রা:) খুশী হয়ে আরও দান করতে থাকেন। ইবনে ইসহাকের মতে তিনি নয়শত উট,একশত ঘোড়া, পাঁচ কিলো সোনা,সাড়ে উনত্রিশ কিলো রৌপ্য আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিলেন এই একটি মাত্র অভিযানে। এছাড়াও রসূল (সা:) এর অধিকাংশ অভিযানে ব্যয়ের দিক থেকে সব সময় সবচেয়ে বেশী এগিয়ে থাকতেন এই মহান সাহাবী।
তাবুক অভিযানের জন্য আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা:) আট হাজার দিনার রসূল (সা:) এর হাতে তুলে দেন। ওমর (রা:) তার এই বিশাল দান দেখে বলেন যে, আমার মনে হচ্ছে আব্দুর রহমান গুনাহগার হয়ে যাচ্ছে। কারণ, সে তার পরিবারের জন্য কিছুই রাখেনি। একথা শুনে রসূল (সা:) জানতে চান, পরিবারের জন্য কিছু রেখেছ কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি যা দান করেছি তার থেকেও বেশী ও উৎকৃষ্ট জিনিস তাদের জন্য রেখেছি। রসূল (সা:) জানতে চান কত? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে রিজিক, কল্যাণ ও প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন, তাই। তার এই বিশাল ব্যয়ে মুনাফিকরা কানাঘুষা শুরু করে দেয়। তারা বলতে থাকে, সে একজন রিয়াকার - লোক দেখানোই তার উদ্দেশ্য। তাদের এই কথার জবাবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সূরা আঁত তওবার ৭১ নং আয়াতটি নাযিল করেন: "এ তো সেই ব্যক্তি যার ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকবে।"
হযরত আসেম ইবনে আদী সাড়ে ১৩ হাজার কিলো খেজুর নিয়ে আসেন। হযরত আব্বাস,তালহা,সা'দ ইবনে উবাদা,মোহাম্মদ ইবনে মোসলেমা সহ অধিকাংশ সাহাবী অঢেল ধন

সম্পত্তি এই অভিযানের জন্য রসূল (সা:) এর সামনে নিবেদন করেন। মহিলারা তাদের হার,বাজুবন্দ,ঝুমকাসহ বিভিন্ন গহনা প্রেরণ করেন। যাদের কিছুই ছিলনা তারা এক মুঠো,দুই মুঠো করেও প্রদান করেন। যারা বেশী ব্যয় করছিল, মুনাফিকরা তাদের যেমন অহংকারী বলছিল। তেমনি যারা একটি দুইটি খেজুর প্রদান করছিল তাদেরকেও বিদ্রূপ করছিল। তারা বলছিল,ওরা একটি দুইটি খেজুর দিয়ে কাইসারের দেশ জয় করতে চলেছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সূরা আঁত তওবাতে বলেন, মোমেনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতীত কিছুই পায়না, তাদেরকে যারা দোষারোপ ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের বিদ্রূপ করেন, ওদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

এই অভিযানের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়ের দিকে নজর না দিলে সাহাবীদের প্রতি অন্যায় করা হবে। আর সেটি হলো এই অভিযানের সময়কাল। মদীনার অধিবাসীগণ ছিলেন কৃষিজীবি। সারা বছর কঠোর পরিশ্রমের পর একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে যখন তারা এই পরিশ্রমের ফল অর্থাৎ ফসল ঘরে তোলেন। সময় মতো ফসল ঘরে তুলতে না পারলে তাদের সারা বছরের পরিশ্রমই পন্ড হয়ে যায়। আর তাই এই সময় অন্য কোন কাজে যোগ দেয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারেননা। আর আল্লাহর তায়ালা তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষার জন্য এই সময়টায় বেছে নেন। তাবুক অভিযানের নির্দেশ এমন একটি সময় দেয়া হয়, যখন তাদের ফসল ঘরে তোলার সময়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে যারা এই অভিযানে যোগ দিবেন, তাদের পক্ষে এই বছরে আর ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হবেনা। এই বিষয়টি ছিল তাদের কাছে পরিষ্কার। ফলে এই অভিযানে একমাত্র তাদের পক্ষেই অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল যাদের মধ্যে তাকওয়া “আল্লাহভীতি” ছিল অতি উচ্চ পর্যায়ে। আর এজন্য এই অভিযানে কোন মোনাফেক যোগ দিতে সক্ষম হয়নি। এমনকি তিনজন মু’মিন ঈমানদার ব্যক্তিও এই পরীক্ষাতে অকৃতকার্য হয়ে যায় অর্থাৎ তিনজন মু’মিন এই অভিযানে যোগ দিতে ব্যার্থ হন। অভিযান শেষে সকল মোনাফেকদের অযুহাত গ্রহণ করে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ক্ষমা করে দিলেও এই তিন মু’মিনকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়। তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়। দীর্ঘ চল্লিশদিন যাবৎ তাঁরা এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করেন। এমনকি এক পর্যায়ে স্ত্রীদের থেকেও পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসে। যখন তাদের তাকওয়ার বিষয়টা সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা ঘোষণা করে সূরা আত তাওবা নাযিল করেন। একারণেই এই অভিযানটি ইসলামের ইতিহাসে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস হিসাবে স্থান করে নেয়।

হযরত সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী (রা:)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রা:)কে হোমসের গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দেন। কিছুদিন পর হোমসের একটি প্রতিনিধি দল আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে দেখা করতে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের গরীব, মিসকিনদের একটি তালিকা আমাকে দাও। আমি তাদেরকে কিছু সাহায্য করব। তারা একটি তালিকা দিলো যাতে সাঈদ ইবনে আমেরের নামটিও ছিল। খলিফা জানতে চাইলেন কে এই সাঈদ ইবনে আমের? তারা বলল, আমাদের আমীর অর্থাৎ হোমসের গভর্নর।

তিনি জানতে চাইলেন, তোমাদের আমীরও কি এতো গরীব? তারা বলল, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! একাধারে কয়েকদিন যাবত তাঁর বাড়ীতে উনুনে হাড়ি চড়ে না। একথা শুনে খলীফা ওমর এতো কাঁদলেন যে তার দাড়ি ভিজে গেল। খলিফা এক হাজার দিনার একটি থলিতে ভরে বললেন, আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম জানিয়ে বলবে, আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য আমীরুল মু'মিনীন এই অর্থ পাঠিয়েছেন। প্রতিনিধি দল ফেরত এসে তার বাড়ীতে গেলেন। তারা তাদের আমিরকে খলিফার সালাম পৌঁছে দিলেন এবং আমীরুল মু'মীনের দেয়া সেই টাকার থলিটিও দিলেন এবং জানালেন এটি একান্তই আপনার ব্যক্তিগত। থলিটি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি এমনভাবে ইন্নালিল্লাহ পড়লেন যে, তাঁর স্ত্রী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এসে জানতে চাইলেন, সাঈদ কি হয়েছে? খলীফা কি ইন্তেকাল করেছেন? তিনি বললেন, না। তার থেকেও বড় ঘটনা। স্ত্রী বললেন, তাহলে মুসলিমদের কোন বিপর্যয়? তিনি বললেন, না। তার থেকেও বড় কিছু। স্ত্রী বললেন কি সেই বড় জিনিষ। তিনি বললেন দুনিয়া আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। স্ত্রী জানতেও চাইলেন না, কি সেই ঘটনা। বরং সাথে সাথে বললেন, তাহলে বিপদ দূর করে ফেলুন। তিনি বললেন, তুমি কি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে? স্ত্রী বললেন অবশ্যই। অতঃপর দুইজন মিলে সেই অর্থ অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

সাহাবীদের জীবন ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'র হক আদায়ের অসংখ্য ঘটনায় ভরপুর। আমি সেখান থেকে সামান্য কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরলাম মাত্র।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ)

সাহাবীদের জীবনের মতোই ছিল তাবীঈদের জীবন। আল্লাহর পথে ব্যয়ের এবং সেই ব্যয়ের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃত ওয়াদা পূরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উঠে এসেছে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ) এর জীবনে। ইবনুল জাওযী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। সেই ঘটনাটিই হুবহু তুলে ধরা হলোঃ

খলিফা আবু জা'ফর আল মানসুর আব্দুর রহমান ইবনে আল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা:) কে বললেন: আমাকে কিছু উপদেশ মূলক কথা শোনান। তিনি বললেন, আমি যা দেখেছি তাই বলবো, না যা শুনেছি তাই? খলিফা বললেন, যা দেখেছেন তাই।
তিনি বললেন, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ) বারোটি ছেলে রেখে যান। আর তাদের জন্য রেখে যান মাত্র ১৭টি দিনার। এর মধ্যে কাফনের জন্য ৫ দিনার আর কবরের জায়গা কেনার জন্য ব্যয় হয় ২ দিনার। বাকী দশ দিনার ছেলেদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।
অন্যদিকে হিসাম ইবনে আব্দুল মালিকও ১২টি ছেলে রেখে মারা যান। তার পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করলে প্রত্যেকে পায় দশ লক্ষ দিরহাম করে। আমি ওমরের এক ছেলেকে একদিন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ১শ' ঘোড়া দান করতে যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি হিসামের এক ছেলেকে মানুষের নিকট থেকে সদকা গ্রহণ করতে।
সুবহান আল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করলে গরীব হয়ে যাওয়ার যে ভয় আমরা পাই, তা আসলে শয়তানের ওয়াস ওয়াসা মাত্র। উপরের ঘটনাটি তার একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এই ঘটনাটি গভীরভাবে চিন্তার দাবী রাখে।

এরপর যে বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনতে হয়,তাহলো ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের পুত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য একশত ঘোড়া প্রদান করেন। আমরা যদি এই সময়কালে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করি এবং সেই সাথে রাসূলুল্লাহ (সা:) ও সাহাবীদের সময়কালে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখব যে, তাদের অধিকাংশ ব্যয় হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য। কখনও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য,কখনও ইসলামী সমাজ রক্ষার জন্য।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর উপর আল কোরআনের বেশ কিছু আয়াত আমরা তুলে ধরেছি। সেই আয়াতগুলোকে যদি আমরা গভীরভাবে অধ্যায়ন করি, তাহলে সেখানেও আমরা একই অবস্থা দেখতে পাই। এই আহবান গুলো করা হয়েছিল মূলতঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের রক্ষার জন্য। এই বিষয়টি আমি পরের অধ্যায়ে একটি আয়াতের তাফসীর প্রসংগে রাসূল (সাঃ) এর একজন সাহাবীর ব্যাখ্যার মাধ্যমে আরও পরিস্কারভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশা'আল্লাহ।

আল কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হুযায়ফা (রাঃ)

সাহাবীগণ আল্লাহর পথে ব্যায়ের বিষয়টি কিভাবে চিন্তা করতেন, তা আরও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এর সূরা আল বাকারার ১৯৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। সেই আয়াতটির তাফসীর প্রসংগে এ একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হলোঃ

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং স্বীয় হস্তকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। **সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৯৫**

এই আয়াতটি প্রসঙ্গে অনেক তাফসীরকারক এমনও বলেছেন যে, এমনভাবে আল্লাহর পথে খরচ করোনা যেন নিজেও অভাবগ্রস্থ হয়ে যাও বা নিজেও ধ্বংসের মুখে পতিত হও। কিন্তু মুফাসসীর ইবনে কাসীর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা সাহাবীগণ দিয়েছেন,সেটি তুলে ধরেছেন। ইবনে কাসীর(রহঃ) সাহাবীদের যে মতামত তুলে ধরেছেন সেই মতামত আমি হুবহু তুলে ধরলামঃ

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয়কারীদের সম্পর্কে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী)। মনীষীগণও এই আয়াতের তাফসীরে একথাই বলেছেন। হযরত আবু ইমরান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাজিরগণের একব্যক্তি কনষ্টান্টিনোপলের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্য বাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ চালান এবং তাদের ব্যুহ ভেদ করে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তখন কতকগুলো লোক পরস্পর বলাবলি করে, দেখ! এই ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। হযরত আবু আইউব (রাঃ) একথা শুনে বলেনঃ এই আয়াতের সঠিক ভাবার্থ আমরাই ভাল জানি। জেনে রেখ যে, এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সহচর্যে থেকেছি, তাঁর সাথে যুদ্ধ জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছি এবং সদা তাঁর সাহায্যের কাজেই থেকেছি। অবশেষে ইসলাম বিজয়ীর বেশে প্রকাশিত হয় এবং মুসলমানেরা জয় লাভ করে। তখন আমরা আনসারগণ

একদা একত্রিত হয়ে এই পরামর্শ করি যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীর (সাঃ) সহচার্যের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁর সেবার কার্যে নিযুক্ত থেকেছি এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছি। এখন আল্লাহর ফযলে ইসলাম বিস্তারলাভ করেছে, মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছেন এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। এতদিন ধরে না আমরা আমাদের সন্তানাদির খবরা খবর নিতে পেরেছি, না মাল-ধন, জমি-জমা ও বাগ-বাগিচার দেখাশুনা করতে পেরেছি। সুতরাং এখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া উচিৎ। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া যেন নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামিল। (সুনান-ই-আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সুনান-ই-নাসায়ী)।

উপরের পর্যালোচনায় একটি স্বাভাবিক বাস্তবরূপ আমাদের সামনে উঠে এসেছে। সাহাবীদের বিষয়ে আমরা অতি মানবীয় বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পেলাম আনসার সাহাবিগণ আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই সংসার ও ব্যবসা বাণিজ্যে মনোযোগের কথা ভাবছিলেন। আর এই আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন তাদের এই ভাবনা শুধু ভুলই না বরং তাঁরা নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। বর্তমান মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মুসলমানগণ বিশেষ করে পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানগণ এই ধরণের বাস্তব চিন্তা করতে অভ্যস্থ,এর বাইরে তারা চিন্তা করতেও পারেন না। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু আইউব (রাঃ) যেভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা থেকে হয়তো আমাদের এই উপলব্ধি আসবে যে, আমাদের এই চিন্তাভাবনা গুলোই মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ।

পরিশেষ

আমরা আমাদের আলোচনার শুরুতে যে বিষয়টি সামনে এনেছিলাম, তা ছিল এই যে, আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য বর্তমান মুসলিম উম্মাহ কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় আনে, কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয় এবং সে অনুযায়ী কোন খাতগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে থাকে। সেই সাথে আমরা বলেছিলাম, বর্তমান মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনা করছেন, যে খাতগুলো বেশী করে পছন্দ করছেন, ইসলামের ইতিহাসের শুরুতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), সাহাবীগণ ও তাবে তাবেয়ীগণ সেই খাতগুলোকে বর্তমান সময়ের মতো সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন কি'না, বিবেচনা করেছিলেন কি'না?

এই বিশ্লেষণ করতে যেয়ে, আমরা প্রথমেই আল কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য কিভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সে বিষয়গুলো তুলে আনার চেষ্টা করেছি, যেন আমরা সর্বপ্রথম তত্বগত বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বুঝে নিতে পারি। এরপর স্বয়ং রাসূল (সাঃ) এর জীবনে আল কোরআনের আল্লাহর পথে ব্যয়ের আয়াতগুলো কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল, তিনি সেই আয়াতগুলোকে কেন্দ্র করে কিভাবে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেগুলো তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিভাবে তিনি সেই আয়াতগুলো সামনে এনে সাহাবীদের আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং সাহাবীগণ কিভাবে সেই আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন তার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ এবং প্রথমদিকের স্কলারগণের ইতিহাসের একটি নির্যাস উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, যেন আমরা টেক্সট ও কন্টেক্সটকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

সেই বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত নরম দিলের মানুষ ছিলেন। নবী হওয়ার পূর্বেই তিনি মানুষের জন্য কিছু করার অবিরত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। রাসুল হওয়ার পূর্বে চল্লিশ বছর যাবত তাঁর এলাকার এতিম,বিধবা আর অসহায়দের সাহায্য সহযোগীতা করে গেছেন। কিন্তু নিজের সমস্ত কিছু উজার হয়ে গেলেও এই মানুষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী করে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং বিশ্লেষণের বিচারে আমরা এই কথাটি বলতে পারি যে, বিশ্বের সর্বকালের সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিটি তার এই কাজে সম্পূর্ণরূপে সফল হতে পারেননি।

কিন্তু যখন তিনি নবী হিসাবে আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করলেন। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও শক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করলেন। অসহায়,এতিম, বিধবাদের সাহায্য করার বিষয়টা কিছুটা হলেও গৌন হয়ে গেল। কিন্তু এর অর্থ এটা

নয় যে, তিনি তাদের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি পরিস্কারভাবে জানতেন, এই তাওহীদের বাণী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তিনি মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবেন। তাইতো ইসলামের দাওয়াতের একেবারে প্রাথমিক সময়েই তিনি বলেছিলেন, "একদিন এমন একটি সময় আসবে, যখন একজন মহিলা একাকী হাজরামাউত থেকে উটে করে খানায়ে কাবায় হজ্জ্ব করতে আসবে কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সে ভয় পাবে না।" আদি ইবনে হাতিম তাঈ (রাঃ) পরবর্তীতে বলেছেন, তিনি নিজ চোখে রাসূল (সাঃ) এর এই হাদীসটি সত্য হতে দেখেছেন। শুধু তাই নয়, ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সময় মানুষ যাকাতের অর্থ নিয়ে অভাবী লোক খুজে বেড়িয়েছে কিন্তু তারা কোন অভাবী লোকের সন্ধান পাইনি। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকার জন্য রাসূল (সাঃ), সাহাবিগণ, তাবেঈগন, তাবে তাবেঈগণ তাদের গোটা জীবণ 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' ও 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর' উপর অতিবাহিত করেছেন। একারণেই রাসূল (সাঃ) ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সমস্ত অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেছেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবু বকর সিদ্দিক (রা:) একের পর এক দাস কিনে মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি কিন্তু যেকোনো দাসের ক্ষেত্রে এই কাজটি করেননি। তিনি শুধুমাত্র সেই সব দাসকে মুক্ত করেছেন যারা শিরক ও মুশরিকদের বাদ দিয়ে আল্লাহ ও তার রসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়েছিলেন। ভালোভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায়, তার এই কাজটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

আমরা হযরত সুহাইব ইবনে রুমি (রা:) এর ঘটনা তুলে ধরেছি। চিন্তা করে দেখুন তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি কোন এতিম,বিধবা বা কোন অসহায়ের কাছে প্রদান করেননি। বরং সেই সকল সম্পদ তিনি তুলে দিয়েছেন আল্লাহর শত্রু মুশরিকদের হাতে। শত্রুদের হাতে তুলে দেয়ার পরেও এই ব্যয়টি কেন আল্লাহ তায়ালা এতো পছন্দ করলেন, কেন রসূল (সা:) তার এই ব্যয়কে শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বললেন? তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমরা ভালোভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারব যে,ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সে সময় সুহাইব ইবনে রুমির (রা:) সম্পদের চেয়ে আল্লাহ প্রেমী,রসূল প্রেমী সুহাইব ইবনে রুমিকেই বেশী প্রয়োজন ছিল। তাইতো সে সময় সমস্ত মুসলমানদেরকে যেকোনভাবে হিযরত করা ফরজ করে দেয়া হয়েছিল। সুহাইব ইবনে রুমি সেই হিজরত করার জন্য তার সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। আর তাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে তার এই ব্যয়টি এতো পছন্দনীয় হয়েছিল।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আপনি যে ক্ষেত্রেই ব্যয় করুন না কেন, সেই ব্যয়টি যদি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য করে থাকেন,তাহলে সেটিই হবে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পর সেই সমাজ রক্ষা করার জন্যও যদি ব্যয় করা হয়,সেটিও একই পর্যায়ভুক্ত। তাবুক অভিযানের জন্য সাহাবীদের এতো ত্যাগের কারণও ছিল এটি। তাবুক অভিযানটি পরিচালনা করা হয়েছিল মূলত: ইসলামী সীমান্তে রোমানদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার অভাব দেখা

দেয়ার কারণে। এই নিরাপত্তার অভাব দূর করার জন্যই রসূল (সা:) এই অভিযান পরিচালনা করেন।

সুতরাং উপরের সমস্ত আলোচনা থেকে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী সমাজ রক্ষার জন্য ব্যয় করাটাই হচ্ছে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'র (অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয়ের) জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। আল্লাহ আমাদেরকে এই সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার সুযোগ দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এটাই হোক আমাদের বাসনা। আমীন।

রেফারেন্স বই সমূহ:

আল কোরআনঃ সহীহ ইন্টারন্যাশনাল থেকেই বেশী অনুবাদ নেয়া হয়েছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তাফসীর ইবনে কাসীরের ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অনুবাদ ও তাফহীমুল কোরআনের আব্দুল মান্নান তালিবের অনুবাদ থেকেও সহায়তা নেয়া হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের জীবনির ক্ষেত্রে সহায়তা নেয়া হয়েছে ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম, আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরীর আর রাহীকুল মাখতুম, হাফেজ ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া থেকে। এছাড়াও সহায়ক বই হিসাবে ছিল ডঃ আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশার সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন, তালিবুল হাশিমির বিশ্ব নবীর সাহাবী, ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদের আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, তাবে'য়ীদের জীবনকথা, ইযলাতুল খেফা, আশারায়ে মুবাশ্বেরা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেরও সহায়তা নেয়া হয়েছে। তাবারী ও বালাযুরী থেকেও রেফারেন্স ক্রস চেক করা হয়েছে।

লেখকের বই সমূহঃ

১। আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়
২। আল কোরআনের বিষ্ময়কর প্রভাব
৩। ডাকবেনা কেন আল্লাহর দিকে?
৪। দু'আ - মু'মিন জীবনের নিত্যসঙ্গী
৫। প্রফেটিক প্যারেন্টিং
৬। প্রফেটিক লিডারশীপ
৭। তারাবীর নামাজে আল কোরআন
৮। কোরআনের আলোকে চরিত্র গঠন

লেখক পরিচিতিঃ

লেখক অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী একজন বাংলাদেশী। যিনি প্রবাস জীবনে থেকেও মাতৃভূমির টানে মাতৃভাষাতে লেখালেখি ও দেশ নিয়ে তার চিন্তাভাবনা গুলো বিভিন্নভাবে তুলে ধরেন। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী। তিনি ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার পার্কপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ঝিনাইদহ সরকারী বালক বিদ্যালয় ও ঝিনাইদহ কেসি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কুইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। বাংলাদেশে আইটি সেক্টরে কিছুদিন অবদান রাখার পর উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি অষ্ট্রেলিয়াতে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি প্রফেশনাল আইটি ডিপ্লমা নেন এবং সিডনী ইউনিভার্সিটিতে মাষ্টার্সে ডাটাবেইজের উপর পড়াশোনা করেন। বর্তমানে তিনি সিডনীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি দুই কন্যা ও এক সন্তানের জনক। তার স্ত্রী মহসিনা কাউসার একজন কম্পিউটর প্রকৌশলী। বর্তমানে সিডনীর একটি কলেজে সিনিয়র লেকচারার হিসাবে কর্মরত আছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখকের গবেষণামূলক বইগুলো চোখে পড়ার মতো।

পরিবেশনায় দারুল আরকাম পাবলিকেশন্স